بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

বই নং ৪৩। www.motaher21.net

اشْتَرٰى

" ক্রয় করে।"

" Purchased."

সুরা: আত-তওবা

আয়াত নং :-111

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ ؕاِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕيُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْ
الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আর আল্লাহর চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা-বেচা করছো সেজন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

তাফসীর :

আয়াতের শুরুতে ক্রয় শব্দের ব্যবহার করা হয়। মুসলিমদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয় বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়; কেননা, এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ের স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। মালামাল হলো আল্লাহরই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। তারপর আল্লাহ তাকে অর্থ সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করেন। তাই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদেরকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ। [বাগভী]

হাসান বসরী বলেন, ‘লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন’। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও। [বাগভী]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জামিন হয়ে যান যিনি তাঁর রাস্তায় বের হয়। তাকে শুধুমাত্র আমার রাহে জিহাদই এবং আমার রাসূলের উপর বিশ্বাসই বের করেছে। আল্লাহ তার জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন যে, যদি সে মারা যায় তবে তাকে জান্নাত দিবেন অথবা সে যা কিছু গনীমতের মাল পেয়েছে এবং সওয়াব পেয়েছে তা সহ তাকে তার সে ঘরে ফিরে পৌঁছিয়ে দিবেন যেখান থেকে বের হয়েছে’। [বুখারী: ৩১২৩; মুসলিম: ১৮৭৬]।

আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তাদের কাজ হল তারা আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় জিহাদ করবে, শত্রুদের হত্যা করবে, প্রয়োজনে নিজেরা নিহত হবে। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যা দরকার যেমন; ক্রেতা, বিক্রতা, পণ্য মূল্য সবকিছু এখানে উল্লেখ করেছেন।

তাই একজন মু’মিন তার জীবনকে যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করবে এতটুকু তার ইখতিয়ার নেই। যেহেতু তার জান-মাল আল্লাহ তা‘আলার কাছে বিক্রি করা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার পথে বের হয়, একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পথে জিহাদ ও রাসূলের সত্যতা প্রমাণ করা। যদি এ অবস্থাতেই মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা‘আলা তার যিম্মাদার যে, তিনি তাকে জান্নাতে দেবেন। আর যদি মারা না যায় তাহলে বাড়িতে গনীমত অথবা প্রতিদানসহ ফিরাবেন। (সহীহ বুখারী হা: ৭৪৫৭)

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে ঈমানের যে ব্যাপারটা স্থিরকৃত হয় তাকে কেনাবেচা বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ঈমান শুধুমাত্র একটা অতি প্রাকৃতিক আকীদা-বিশ্বাস নয়। বরং এটা একটি চুক্তি। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে বান্দা তার নিজের প্রাণ ও নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এর বিনিময়ে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ওয়াদা কবুল করে নেয় যে, মরার পর পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনা-বেচার তাৎপর্য ও স্বরূপ কি তা ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে।

নিরেট সত্যের আলোকে বিচার করলে বলা যায় মানুষের ধন-প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। কারণ তিনিই তার কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্রষ্টা। সে যা কিছু ভোগ ও ব্যবহার করেছে তাও তিনিই তাকে দিয়েছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো কেনাবেচার কোন প্রশ্নেই ওঠে না। মানুষের এমন কিছু নেই, যা সে বিক্রি

করবে। আবার কোন জিনিস আল্লাহর মালিকানার বাইরেও নেই, যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যা আল্লাহ পুরোপুরি মানুষের হাতে সোর্পদ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ নিজের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Free will an freedom of choice)। এ ইখতিয়ারের কারণে অবশ্যই প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মানুষ এ মর্মে স্বাধীনতা লাভ করে যে, সে চাইলে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারে এবং চাইলে তা অস্বীকার করতে পারে। অন্য কথায় এ ইখতিয়ারের মানে এ নয় যে মানুষ প্রকৃত পক্ষে তার নিজের প্রাণের নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির এবং দুনিয়ায় সে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে, তার মালিক হয়ে গেছে। এ সঙ্গে এ জিনিসগুলো সে যেভাবে চাইবে সেভাবে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেছে, একথাও ঠিক নয়। বরং এর অর্থ কেবল এতটুকুই যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষে থেকে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজেরই নিজের সত্তার ও নিজের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর আল্লাহর মালিকানা ইচ্ছা করলে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের মালিক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের ইখতিয়ার তথা স্বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনা-বেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। আসলে এ কেনা-বেচা এ অর্থে নয় যে, মানুষের একটি জিনিস আল্লাহ কিনতে চান, বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোর্পদ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি মানুষের দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে (বাধ্য হয়ে নাও)। এ সঙ্গে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অর্জিত নয় বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মু'মিন। ঈমান আসলে এ কেনা-বেচার আর এক নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে অথবা অঙ্গীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনা-বেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে সে কাফের। আসলে এ কেনা-বেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পারিভাষিক নাম কুফরী। কেনা-বেচার এ তাৎপর্য ও স্বরূপটি অনুধাবন করার পর এবার তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা যাকঃ

এক. এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ মানুষকে দু'টি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে, তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিকাকে মালিক মনে করার এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ের নেমে না আসার মতো সৎ আচরণ করে কিনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিজের প্রভু ও মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আজ নগদ যে মূল্য পাওয়া যাচ্ছে, না বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তার পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় স্বাদ বিক্রি করতে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাজী হয়ে যাবার মত আস্থা তার প্রতি আছে কিনা।

দুইঃ যে ফিকাহর আইনের ভিত্তিতে দুনিয়ার ইসলামী সমাজ গঠিত হয় তার দৃষ্টিতে ঈমান শুধুমাত্র কতিপয় বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। এ স্বীকৃতির পর নিজের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যুক হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শরীয়াতের কোন বিচারক কাউকে অমু'মিন বা ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ঈমানের তাৎপর্য ও স্বরূপ হচ্ছে, বান্দা তার চিন্তা ও কর্ম উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিবে এবং নিজের মালিকানার দাবী পুরোপুরি তার

সপক্ষে প্রত্যাহার করবে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দেয় এবং নামায-রোযা ইত্যাদির বিধানও মেনে চলে, কিন্তু নিজেকে নিজের দেহ ও প্রাণের নিজের মন, মস্তিষ্ক ও শারীরিক শক্তির নিজের ধন-সম্পদ, উপায়, উপকরণ ইত্যাদির এবং নিজের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করে এবং সেগুলোকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে, তাহলে হয়তো দুনিয়ায় তাকে মু'মিন মনে করা হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অবশ্যই অমু'মিন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে কেনা-বেচার ব্যাপারে ইমানের আসল তাৎপর্য ও স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে আদতে কোন কেনা-বেচার কাজই করেননি। যেখানে আল্লাহ চান সেখানে ধন প্রাণ নিয়োগ না করা এবং যেখানে তিনি চান না সেখানে ধন প্রাণ নিয়োগ ও ব্যবহার করা-এ দু'টি কার্য ধারাই চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেয় যে, ইমানের দাবীদার ব্যক্তি তার ধন প্রাণ আল্লাহর হাতে বিক্রি করেইনি অথবা বিক্রির চুক্তি করার পরও সে বিক্রি করা জিনিসকে যথারীতি নিজের মনে করেছে।

তিনঃ ঈমানের এ তাৎপর্য ও স্বরূপ ইসলামী জীবনাচরণকে কাফেরী জীবনাচরণ থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে সে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে। তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটতে পারে না। তবে কোন সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের কেনা-বেচার চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা অবলম্বন করাও তার পক্ষে সম্ভব। এটা অবশ্যই ভিন্ন ব্যাপার। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের সমন্বয়ে গঠিত কোন দল বা সমাজ সমষ্টিগতভাবেও আল্লাহর ইচ্ছা ও তার শরয়ী আইনের বিধিনিষেধ মুক্ত হয়ে কোন নীতি পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি এবং কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক আচরণ অবলম্বন করতে পারে না। কোন সাময়িক গাফলতির কারণে যদি সেটা অবলম্বন করেও থাকে তাহলে যখনই সে এ ব্যাপারে জানতে পারবে তখনই স্বাধীন ও স্বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বন্দেগীর আচরণ করতে থাকবে। আল্লাহর আনুগত্য মুক্ত হয়ে কাজ করা এবং নিজের ও নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে নিজে নিজেই কি করবোনা করবো, সিদ্ধান্ত নেয়া অবশ্যই একটি কুফরী জীবনাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের জীবন যাপন পদ্ধতি এ রকম তারা মুসলমান নামে আখ্যায়িত হোক বা অমুসলিম নামে তাতে কিছু যায় আসে না।

চারঃ এ কেনা-বেচার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর যে ইচ্ছার আনুগত্য মানুষের জন্য অপরিহার্য হয় তা মানুষের নিজের প্রস্তাবিত বা উদ্ভাবিত নয় বরং আল্লাহ নিজে যেমন ব্যক্ত করেন তেমন। নিজে নিজেই কোন জিনিসকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে থাকা মূলত আল্লাহর ইচ্ছা নয় বরং নিজেরই ইচ্ছার আনুগত্য করার শামিল। এটি এ কেনাবেচার চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর হেদায়াত থেকে নিজের সমগ্র জীবনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আল্লাহর সাথে কৃত নিজের কেনা-বেচার চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।

এ হচ্ছে এ কেনা-বেচার অন্তনিহিত বিষয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কেনা-বেচার ক্ষেত্রে বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসানের পর মূল্য (অর্থাৎ জান্নাত।) দেবার কথা বলা হয়েছে কেন তাও আপনা আপনিই বুঝে আসে। বিক্রেতা নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেবে কেবলমাত্র এ অঙ্গীকারের বিনিময়েই যে জান্নাত পাওয়া যাবে তা নয়। বরং বিক্রেতা নিজের পার্থিব জীবনে এ বিক্রি করা জিনিসের

ওপর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের রক্ষক হয়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করবে। এরূপ বাস্তব ও সক্রিয় তৎপরতার বিনিময়েই জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং বিক্রেতার পার্থিব জীবনকাল ও শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনা-বেচার চুক্তি করার পর সে নিজের পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেছে একমাত্র তখনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে পর্যন্ত ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মূল্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

এ বিষয় গুলো পরিষ্কার ভাবে বুঝে নেবার সাথে সাথে এ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কোন প্রেক্ষাপটে এ বিষয়বস্তুটির অবতারণা হয়েছে তাও জেনে নেয়া উচিত। ওপর থেকে যে ধারাবাহিক ভাষণ চলে আসছিল তাতে এমন সব লোকের কথা ছিল যারা ঈমান আনার অঙ্গীকার করেছিল ঠিকই কিন্তু পরীক্ষার কঠিন সময় সমুপস্থিত হলে তাদের অনেকে গাফলতির কারণে, অনেকে আন্তরিকতার অভাবে এবং অনেকে চূড়ান্ত মুনাফিকীর পথ অবলম্বন করার ফলে আল্লাহর ও তার দ্বীনের জন্য নিজের সময় ধন সম্পদ স্বার্থ ও প্রাণ দিতে ইতস্তত করেছিল। কাজেই এ বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর আচরণের সমালোচনা করার পর এখন তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হচ্ছে, তোমরা যে ঈমান গ্রহণ করার অঙ্গীকার করেছো তা নিছক আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব মেনে নেবার নাম নয়। বরং একমাত্র আল্লাহই যে তোমাদের জান ও তোমাদের ধন-সম্পদের মালিক ও অকাট্য ও নিগূঢ় তত্ব মেনে নেয়া ও এর স্বীকৃতি দেয়ার নামই ঈমান। কাজেই এ অঙ্গীকার করার পর যদি তোমরা এ প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হুকুমে কুরবানী করতে ইতস্তত করো এবং অন্যদিকে নিজের দৈহিক ও আত্মিক শক্তিসমূহ এবং নিজের উপায়-উপকরণ সমূহ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকো তাহলে এ থেকে একথাই প্রমাণিত হবে যে, তোমাদের অঙ্গীকার মিথ্যা। সাচ্চা ঈমানদার একমাত্র তারাই যারা যথার্থই নিজেদের জান-মাল আল্লাহর হাতে বিকিয়ে দিয়েছে এবং তাকেই এ সবের মালিক মনে করেছে। তিনি এগুলো যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে নির্দ্বিধায় এগুলো ব্যয় করে এবং যেখানে তিনি নিষেধ করেন সেখানে দেহ ও আত্মার সামান্যতম শক্তিও এবং আর্থিক উপকরণের নগন্যতম অংশও ব্যয় করতে রাজী হয় না।

এ ব্যাপারে অনেক গুলো আপত্তি তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এখানে যে ওয়াদার কথা বলা হয়েছে তা তাওরাত ও ইঞ্জিলে নেই। কিন্তু ইঞ্জিলের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলার কোন ভিত্তি নেই। বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে ইঞ্জিলসমূহ পাওয়া যায় সেগুলোর হযরত ঈসা (আ) এর এমন অনেক গুলো উক্তি পাওয়া যায় যেগুলো এ আয়াতের সমর্থক। যেমনঃ

ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। (মথি ৫: ১০)

যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাইবে এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে। (মথি ১০: ৩৯)

আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী কি ভ্রাতা, কি ভাগিনী কি পিতা ও মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। (মথি ১৯: ২৯)

তবে তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাতে অবশ্যই এ বিষয়বস্তুটি পাওয়া যায় না। শুধু এটি কেন, সেখানে তো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, শেষ বিচারের দিন ও পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির ধারণাই অনুপস্থিত। অথচ এ আকীদা সবসময় আল্লাহর সত্য দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমান তাওরাতে এ বিষয়টির অস্তিত্ব না থাকার ফলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও ঠিক নয় যে, যথার্থই তাওরাতের এ অস্তিত্ব ছিল না। আসলে ইহুদীরা তাদের অবনতির যুগে এতই বস্তুবাদী ও দুনিয়াবি সমৃদ্ধির মোহে এমন পাগল হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের কাছে নিয়ামত ও পুরস্কার এ দুনিয়ায় লাভ করা ছাড়া তার আর কোন অর্থই ছিলো না। এ কারণে আল্লাহর কিতাবে বন্দেগী ও আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে যেসব পুরস্কার দেবার ওয়াদা করা হয়েছিল সে সবকে তারা দুনিয়ার এ মাটিতেই নামিয়ে এনেছিল এবং জান্নাতের প্রতিটি সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যকে তারা তাদের আকাংখিত ফিলিস্তিনের ওপর প্রয়োগ করেছিল। তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে আমরা এ ধরনের বিষয়বস্তু দেখতে পাই। যেমনঃ

হে ইসরায়েল শুন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদা প্রভু, তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদা প্রভুকে প্রেম করিবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ৬: ৪, ৫)

আরো দেখিঃ তিনি কি তোমার পিতা নহেন, যিনি তোমাকে লাভ করিলেন। তিনিই তোমার নির্মাতা ও স্থিতি কর্তা। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২: ৬)

কিন্তু আল্লাহর সাথে এ সম্পর্কের যে পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তোমরা এমন একটি দেশের মালিক হয়ে যাবে যেখানে দুধ ও মধুর নহর প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ ফিলিস্তিন। এর আসল কারণ হচ্ছে, তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা প্রথমত সম্পূর্ণ নয়, তাছাড়া নির্ভেজাল আল্লাহর বাণী সম্বলিত ও নয়। বরং তার মধ্যে আল্লাহর বানীর সাথে অনেক ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য ও সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ইহুদীদের জাতীয় ঐতিহ্য, বংশ প্রীতি, কুসংস্কার আশা-আকাঙ্ক্ষা ভুল ধারণাও ফিকাহ ভিত্তিক ইজতিহাদের একটি বিরাট অংশ একই ভাষণ ও বানী পরম্পরার মধ্যে এমন ভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে, অধিকাংশ স্থানে আল্লাহর আসল কালামকে তার মধ্যে থেকে পৃথক করে বের করে নিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-3

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَۙ

তিনি তোমার ওপর এই কিতাব নাযিল করেছেন, যা সত্যের বাণী বহন করে এনেছে এবং আগের কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে। আর তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছিলেন

তাফসীর :

সাধারণভাবে লোকেরা তাওরাত বলতে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের (পুরাতন নিয়ম) প্রথম দিকের পাঁচটি পুস্তক (old Testament books list) এবং ইঞ্জিল বলতে নিউ টেস্টামেন্টের (নতুন নিয়ম) চারটি প্রসিদ্ধ ইঞ্জিল মনে করে থাকে (New Testament book list) । তাই এ পুস্তকগুলো সত্যিই আল্লাহর কালাম কিনা, এ প্রশ্ন দেখা দেয়। আর এই সঙ্গে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, এই পুস্তকগুলোতে যেসব কথা লেখা আছে যথার্থই কুরআন সেগুলোকে সত্য বলে কিনা। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তাওরাত বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের নাম নয় বরং এগুলোর মধ্যে তাওরাত নিহিত রয়েছে এবং ইঞ্জিল নিউ টেস্টামেন্টের চারটি ইঞ্জিলের নাম নয় বরং এগুলোর মধ্যে ইঞ্জিল পাওয়া যায়। আসলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত লাভের পর থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁর ওপর যেসব বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোই তাওরাত। এর মধ্যে পাথরের তক্তার গায়ে খোদাই করে দশটি বিধান আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। অবশিষ্ট বিধানগুলো হযরত মূসা (আঃ) লিখিয়ে তার বারোটি অনুলিপি করে বারোটি গোত্রকে দান করেছিলেন এবং একটি কপি সংরক্ষণ করার জন্য দান করেছিলেন বণী লাবীকে। এ কিতাবের নাম ছিল তাওরাত। বাইতুল মাকদিস প্রথমবার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এটি একটি স্বতন্ত্র কিতাব হিসেবে সংরক্ষিত ছিল। বনি লাবীকে যে কপিটি দেয়া হয়েছিল, পাথরের তক্তা সহকারে সেটি 'অঙ্গীকারের সিন্দুকে'র মধ্যে রাখা হয়েছিল। বনী ইসরাঈল সেটিকে 'তাওরীত' নামেই জানতো। কিন্তু তার ব্যাপারে তাদের গাফলতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে ইয়াহুদীয়ার বাদশাহ ইউসিয়ার আমলে যখন 'হাইকেলে সুলাইমানী' মেরামত করা হয়েছিল তখন ঘটনাক্রমে 'কাহেন' প্রধান (অর্থাৎ হাইকেল বা উপাসনা গৃহের গদীনশীন এবং জাতির প্রধান ধর্মীয় নেতা)। খিলকিয়াহ একস্থানে তাওরীত সুরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে গেলেন। তিনি একটি অদ্ভুত বস্তু হিসেবে এটি বাদশাহর প্রধান সেক্রেটারীকে দিলেন। সেক্রেটারী সেটিকে এমনভাবে বাদশাহর-সামনে পেশ করেন যেন ঐটি একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার (২-রাজাবলী, অধ্যায় ২২, শ্লোক ৮-১৩ দেখুন) , Download বাইবেল app 1 । এ কারণেই বখ্তে নসর যখন জেরুসালেম জয় করে হাইকেলসহ সারা শহর ধ্বংস করে দিল তখন বনী ইসরাঈলরা তাওরাতের যে মূল কপিটিকে বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং যার অতি অল্প সংখ্যক অনুলিপি তাদের কাছে ছিল, সেগুলো হারিয়ে ফেললো চিরকালের জন্য। তারপর আযরা (উযাইর) কাহেনের যুগে বনী ইসরাঈলদের অবশিষ্ট লোকেরা বেবিলনের কারাগার থেকে জেরুসালেমে ফিরে এলো এবং বাইতুল মাকদিস পূনর্নির্মান করা হলো। এ সময় উযাইর নিজের জাতির আরো কয়েকজন মনীষীর সহায়তায় বনী ইসরাঈলদের পূর্ণ ইতিহাস লিখে ফেললেন। বর্তমান বাইবেলের প্রথম সতেরোটি পরিচ্ছেদ এ ইতিহাস সম্বলিত। এ ইতিহাসের চারটি অধ্যায় অর্থাৎ যাত্রা, লেবীয়, গণনা ও দ্বিতীয় বিবরণে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের

জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। আযরা ও তার সহযোগীরা তাওরাতের যতগুলো আয়াত সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এই জীবন ইতিহাসের বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণের সময়-কাল ও ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ঠিক জায়গা মতো সেগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজেই এখন মূসা আলাইহিস সালামের জীবন ইতিহাসের মধ্যে সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশের নামই তাওরাত। এগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য আমরা কেবলমাত্র নিম্নোক্ত আলামতের ওপর নির্ভর করতে পারি। এ ঐতিহাসিক বর্ণনার মাঝখানে যেখানে লেখক বলেন, প্রভু মূসাকে একথা বললেন অথবা মূসা বলেন, সদাপ্রভু তোমাদের প্রভু একথা বললেন, সেখান থেকে তাওরাতের একটি অংশ শুরু হচ্ছে, তারপর আবার যেখান থেকে জীবনী প্রসঙ্গ শুরু হয়ে গেছে সেখান থেকে ঐ অংশ খতম হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে। মাঝখানে যেখানে যেখানে বাইবেলের লেখক ব্যাখ্যা বা টীকা আকারে কিছু অংশ বৃদ্ধি করেছে, সেগুলো চিহ্নিত করে ও বাছাই করে আসল তাওরাত থেকে আলাদা কিতাবসমূহের গভীর জ্ঞান রাখেন, তারা ঐসব অংশের কোথায় কোথায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মূলক বৃদ্ধি করা হয়েছে কিছুটা নির্ভুলভাবে তা অনুধাবন করতে পারেন। এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলোকেই কুরআন তাওরাত নামে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন এগুলোকেই সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ অংশগুলোকে একত্র করে কুরআনের পাশাপাশি দাঁড় করালে কোন কোন স্থানে ছোট খাটো ও খুঁটিনাটি বিধানের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা গেলেও মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্যতম পার্থক্যও পাওয়া যাবে না। আজও একজন সচেতন পাঠক সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারেন যে, এ দু'টি স্রোতধারা একই উৎস থেকে উৎসারিত। অনুরূপভাবে ইঞ্জিল হচ্ছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইলহামী ভাষণ ও বাণী সমষ্টি, যা তিনি নিজের জীবনের শেষ আড়াই-তিন বছরে নবী হিসেবে প্রচার করেন। এ পবিত্র বাণীসমূহ তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত, সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। হতে পারে কিছু লোক সেগুলো নোট করে নিয়েছিলেন। আবার এমনও হতে পারে, শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ সেগুলো কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। যাহোক দীর্ঘকাল পরে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা কালে তাতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে সাথে ঐ পুস্তিকাগুলোর রচয়িতাদের কাছে মৌখিক বাণী ও লিখিত স্মৃতিকথা আকারে হযরত ঈসার (আঃ) যেসব বাণী ও ভাষণ পৌঁছেছিল সেগুলোও বিভিন্ন স্থানে জায়গা মতো সংযোজিত হয়েছিল। বর্তমানে মথি, র্মাক, লুক ও যোহন লিখিত যেসব পুস্তককে ইঞ্জিল বলা হয় সেগুলো আসলে ইঞ্জিল নয়। বরং ইঞ্জিল হচ্ছে ঐ পুস্তকগুলোতে সংযোজিত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণীসমূহ। আমাদের কাছে সেগুলো চেনার ও জীবনীকারদের নিজেদের কথা থেকে সেগুলো আলাদা করার এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মাধ্যম নেই যে, যেখানে জীবনীকার বলেন, ঈসা বলেছেন অথবা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন-কেবলমাত্র এ স্থানগুলো আসল ইঞ্জিলের অংশ। কুরআন এ অংশগুলোর সমষ্টিকে ইঞ্জিল নামে অভিহিত করে এবং এরই সত্যতার ঘোষণা দেয়। এ বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্র করে আজ যে কেউ কুরআনের পাশাপাশি রেখে এর সত্যতা বিচার করতে পারেন। তিনি উভয়ের মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্যই দেখতে পাবেন। আর যে সামান্য পার্থক্য অনুভূত হবে পক্ষপাতহীন চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা সহজেই দূর করা যাবে।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম, যা তার পূর্ববর্তী যে সমস্ত কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে সেগুলোর সত্যায়নকারী। কিতাবগুলো হল- তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও অন্যান্য সহিফা। ঐ

সমস্ত কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করার জন্য, মূর্খতা থেকে জ্ঞানের আলোর দিশা দেয়ার জন্য, সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের, কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য। সুতরাং যারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই সঠিক পথ পাবে, উভয় কালে লাভবান হবে, সকল প্রকার কল্যাণ ও সওয়াব অর্জন করবে। আর যারা এগুলোর প্রতি অবিশ্বাস করবে ঈমান আনবে না এবং যারা নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘন করবে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ তা'আলার দলীল প্রমাণকে মিথ্যা মনে করবে এবং তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ তথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল ইবাদত সম্পাদন না করে অন্যের জন্যও ইবাদত করবে বা অন্যকে তাঁর সাথে ইবাদতে শরীক করবে তাদের জন্যও রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ)

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আকাশ ও পৃথিবীর কিছুই গোপন নেই" আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না। আকাশ ও যমিনে যা কিছু রয়েছে তার প্রত্যেকটি জিনিস তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। বিষয়টি ছোট হোক বা বড় হোক, কম হোক বা বেশি হোক, প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে হোক, এমনকি গহীন অন্ধকারে কালো পিপীলিকা কিভাবে চলাচল করে তাও তিনি জানেন। মায়ের গর্ভে কী রয়েছে তাও তাঁর জ্ঞানায়ত্বে। মাতৃগর্ভস্থ সন্তান ভাল হবে, না মন্দ হবে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে, সৌভাগ্যবান হবে, না দুর্ভাগ্যবান হবে সবই তাঁর জানা।

সুতরাং সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। অতএব যিনি সবকিছুর ধারক-বাহক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, তাঁকে ভয় করে সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার ও অশ্লীল কাজ-কর্ম বর্জন করা উচিত এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত। তিনি ব্যতীত আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলোতে সে কথাই তুলে ধরেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۭ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۭ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ)

"যেদিন তারা (কবর হতে) বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। (আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন) আজ কর্তৃত্ব কার? একক পরাক্রমশালী আল্লাহরই।" (সূরা মু'মিন ৪০:১৬)

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۭ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ)

“হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না।” (সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৮)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

(اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى)

“আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তদ্ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।” (সূরা আ‘লা ৮৭:৭)

সুতরাং আমাদের উচিত হবে তাঁকে ভয় করে সকল অন্যায় অবিচার বর্জন করা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ কুরআনুল কারীম সকল প্রকার সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

২. কুরআন পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবকে সত্যায়ণকারী, বাতিলকারী নয়।

৩. আল্লাহ তা‘আলা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছু দেখেন ও জানেন।

৪. আল্লাহ তা‘আলা প্রকৃত মা‘বূদ, একমাত্র তিনিই সকল ইবাদত পাওয়ার হকদার।

৬. আল্লাহ তা‘আলা কিতাব ও রাসূল প্রেরণ করে বান্দার ওপর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করেছেন, অতএব অভিযোগ করার কোন সুযোগ নেই।

সুরা: আত-তওবা

আয়াত নং :-112

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাগমনকারী তার ইবাদতকারী, তার প্রশংসা বানী উচ্চারণকারী, তার জন্য যমীনে বিচরণকারী তার সামনে রুকূ ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী (সেই সব মুমিন হয়ে থাকে যারা আল্লাহর সাথে কেনাবেচার সওদা করে) আর হে নবী! এ মুমিনদেরকে সুখবর দাও!

তাফসীর :

[১] এ গুণাবলী হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে- আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন'। আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। তবে এখানে যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ, আল্লাহর রাহে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণের অধিকারী হয়। [কুরতুবী]

[২] অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে আয়াতে উল্লেখিত (السائحون) দ্বারা উদ্দেশ্য সাওম পালনকারীগণ। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত (سائحون) শব্দের অর্থ রোযাদার। [বাগভী; কুরতুবী] তাছাড়া (سائح) বলে জিহাদকারীদেরকেও বুঝায়। তবে মূল শব্দটি (سياحة) যার অর্থঃ দেশ ভ্রমণ। বিভিন্ন ধর্মের লোক দেশ ভ্রমণকে ইবাদাত মনে করতো। অর্থাৎ মানুষ পরিবার পরিজন ও ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে [ইবন কাসীর] এর পরিবর্তে সিয়াম পালনের ইবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আবার কতিপয় বর্ণনায় জিহাদকেও দেশ ভ্রমনের অনুরূপ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমার উম্মতের দেশভ্রমণ হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।' [আবুদাউদ: ২৪৮৬]

[৩] আলোচ্য আয়াতে মুমিন মুজাহিদের আটটি গুণ উল্লেখ করে নবম গুণ হিসেবে বলা হয়েছে "আর আল্লাহর দেয়া সীমারেখার হেফাযতকারী" মূলতঃ এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ অর্থাৎ সাতটি গুণের মধ্যে যে তাফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো যে, এরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরী'আতের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাযতকারী। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

মূল আয়াতে التَّائِبُونَ (আত্ তা-য়েবুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় তাওবাকারী। কিন্তু যে বর্ণনা রীতিতে ও শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা করা ঈমানদারদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে তারা কেবলমাত্র একবার তাওবা করে না বরং সবসময় তাওবা করতে থাকে। আর তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। কাজেই এ শব্দটির মূল প্রাণ সত্তা প্রকাশ কারার জন্য আমি এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এভাবে করেছি তারা আল্লাহর দিকে বারবার ফিরে আসে। মু'মিন যদিও তার পূর্ণ চেতনা ও সংকল্প সহকারে আল্লাহর সাথে নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ কেনা-বেচার কারবার করে কিন্তু যেহেতু বাইরের অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাই অনুভূত হয় যে, প্রাণ তার নিজের এবং ধন ও তার নিজের আর তাছাড়া এ প্রাণ ও ধনের আসল মালিক মহান আল্লাহ। কোন অনুভূত সত্তা নন বরং একটি যুক্তিগ্রাহ্য সত্তা। তাই মু'মিনের জীবনের বারবার এমন সময় আসতে থাকে যখন সে সাময়িকভাবে আল্লাহর সাথে করা তার কেনা-বেচার চুক্তি ভুলে যায়। এ অবস্থায় এ চুক্তি থেকে গাফেল হয়ে সে কোন লাগামহীন কার্যকলাপ করে বসে। কিন্তু একজন প্রকৃতও যথার্থ মু'মিনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এ সমায়িক ভুলে যাওয়ার হাত থেকে যখনই সে রেহাই পায়, তখনই নিজের গাফলতির পর্দা ছিড়ে সে বেরিয়ে আসে এবং অনুভব করতে থাকে যে, অবচেতনভাবে সে নিজের অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে ফেলেছে তখনই সে লজ্জা অনুভব করে, তীব্র অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমা চায় এবং নিজের অঙ্গীকারকে পুনরায় তরতাজা করে নেয়। এ বারবার তাওবা করা, বারবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং প্রত্যেকটি পদস্খলনের পর বিশ্বস্ততার পথে ফিরে আসাই ঈমানের স্থিতি ও স্থায়িত্বের প্রতীক। নয়তো যেসব মানবিক দুর্বলতা সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোর উপস্থিতিতে তার পক্ষে এটা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর হাতে একবার ধন-প্রাণ বিক্রি করার পর চিরকাল পূর্ণ সচেতন অবস্থায় এ কেনা-বেচার দাবী পূরণ করতে থাকবে এবং কখনো গাফলতি ও বিস্মৃতির শিকার হবে না। তাই মহান আল্লাহ মু'মিনের এ সংজ্ঞা বর্ণনা করেন না যে, বন্দেগীর পথে এসে কখনো যার পা পিছলে যায় না সে মু'মিন। বরং বার বার পা পিছলে যাবার পরও প্রতিবারই সে একই পথে ফিরে আসে, এটিকেই আল্লাহ মু'মিনের প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এটিই হচ্ছে মানুষের আত্মের ভেতরের শ্রেষ্ঠতম গুণ।

আবার এ প্রসঙ্গে মু'মিনের গুণাবলীর মধ্যে সবার আগে তাওবার কথা বলার আর একটি উপযোগিতাও রয়েছে। আগে থেকে যে ধারাবাহিক বক্তব্য চলে আসছে তাতে এমনসব লোকের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে যাদের থেকে ঈমান বিরোধী কার্যকলাপের প্রকাশ ঘটেছিল। কাজেই তাদেরকে ঈমানের তাৎপর্য ও তার মৌলিক দাবী জানিয়ে দেবার পর এবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, মু'মিনের যে অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ হচ্ছেঃ যখনই বন্দেগীর পথ থেকে তাদের পা পিছলে যায় তারা যেন সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেদিকে ফিরে আসে। নিজেদের সত্য বিচ্যুতির ওপর যেন অবিচল হয়ে দাড়িয়ে না থাকে এবং পিছনের দিকে বেশী দূরে চলে না যায়।

মূল ইবারতে السَّائِحُونَ (আস সায়েহুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন الصَّائِمُون (আস সা-য়েমুন) অর্থাৎ যারা রোযা রাখে। কিন্তু السَّائِحُونَ আস সায়েহুনা বা বিচরণকারীকে রোযাদার অর্থে ব্যবহার করলে সেটা হবে তার রূপক ও পরোক্ষ অর্থ। এর প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ এটা নয়।

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে, নবী (সা.) নিজেই এ শব্দটির এ অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন সেটিকে নবীর ﷺ ওপর প্রয়োগ করা ঠিক নয়। তাই আমরা একে এর প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করাকেই বেশী সঠিক মনে করি। কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় ইসফাক শব্দটি সরল ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এর মানে হয় ব্যয় করা এবং এর উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা। ঠিক তেমনি এখানে বিচরণ করা মানেও নিছক ঘোরাফেরা করা নয়। বরং এমন উদ্দেশ্যে যমীনে চলাফেরা করা, যা পবিত্র ও উন্নত এবং যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। যেমন, দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা, কুফর শাসিত এলাকা থেকে হিরজত করা, দীনের দাওয়াত দেয়া, মানুষের চরিত্র সংশোধন করা, পরিছন্ন ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করা , আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং হালাল জীবিকা উপার্জন করা। এ গুণটিকে এখানে বিশেষভাবে মু'মিনদের গুণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ জন্য যে, যারা ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও জিহাদের আহবানে ঘর থেকে বের হয়নি তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সত্যিকার মু'মিন ঈমানের দাবী করার পর নিজের জায়গায় আরামে বসে থাকতে পারে না। বরং সে আল্লাহর দীন গ্রহণ করার পর তার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী অবিরাম প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকে।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, তামাদ্দুন অর্থনীতি-রাজনীতি আইন-আদালত এবং যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন তারা তা পুরোপুরি মেনে চলে। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড এ সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছা মতো কাজ করতে থাকে না। আবার কখনো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মনগড়া আইনের বা মানুষের তৈরী ভিন্নতর আইনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। এছাড়াও আল্লাহর সীমারেখা গুলো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এগুলো লঙ্ঘন করতে দেয়া যাবে না। কাজেই সাচ্চা ঈমানদারদের সংজ্ঞা কেবল এতটুকুই নয় যে, তারা নিজেরা আল্লাহর সীমা মেনে চলে বরং তাদের অতিরিক্ত গুণাবলী হচ্ছে এই যে, তারা দুনিয়ায় আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেগুলো অটুট রাখার জন্য নিজেরদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

যে মু'মিনদের জান-মাল আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন তাদের আরো বৈশিষ্ট্য ১১২ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম: হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বলেন: সময়মত সালাত আদায় করা। আমি বললাম: তারপর কোন্টি? তিনি বলেন: পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করা। (সহীহ বুখারী হা: ২৭৮২)

السَّآئِحُوْنَ - দ্বারা উদ্দেশ্য সওম পালনকারী, রোযাদার। তবে শব্দটি জিহাদের অর্থেও ব্যবহার হয়। নাবী (সাঃ) বলেন: আমার উম্মাতের সিয়াহাত হল আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ। (আবূ দাঊদ হা: ২৪৮৬২, হাসান)

(وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ)

'আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী;- অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। হাসান বাসরী (রাঃ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার ফরয বিধানাবলী যথাযথ পালনকারী। (ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

অতএব একজন মু'মিন যার জান-মাল আল্লাহ তা'আলার কাছে বিক্রিত সে কখনো নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করতে পারে না, অবশ্যই তা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে পরিচালনা করতে হবে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মু'মিনদের জান-মাল আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।

২. আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ ও শাহাদাতের ফযীলত জানলাম।

৩. একজন মু'মিনের উচিত আয়াতে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত কিনা সে বিষয়ে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।